NAHWA EDITIONS · NE-003

নফসের অজুহাত

নিজেকে বোঝানোর দশটি পরিচিত বাক্য—আর সেগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনাকে চিনে নেওয়ার একটি reflective guide.

DIGITAL READING

v1.0 · First Edition
First release · 22 Oct 2026

EDITION & SOURCE

নফসের অজুহাত

মূল ওয়েব পাণ্ডুলিপি থেকে সংরক্ষিত প্রকাশনা প্রার্থী। দশটি অধ্যায়ের লেখক-লেখা, উদ্ধৃতি, তথ্যসূত্র ও পৃথক editorial/context notes অক্ষত রাখা হয়েছে।

EDITION

v1.0 · First Edition

BOOK ID

NE-003

STRUCTURE

১০টি অধ্যায়

SOURCE

Nahwa Ad-Deen · ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

Source-preserving First Edition. The ten source chapters and the recorded context notes are retained. No independent scholar endorsement is claimed.

লেখা ও সম্পাদকীয় নোট

কুরআন ও হাদিসের বাংলা ভাষ্যকে মূল audit অনুযায়ী অর্থভিত্তিক উপস্থাপন হিসেবে রাখা হয়েছে। Reference/context audit v2-এর নথিভুক্ত প্রেক্ষাপট-নোটগুলো লেখকের মূল আলোচনা থেকে দৃশ্যত পৃথক।

First Edition v1.0 · 22 Oct 2026. Website edition is canonical/latest. Substantive corrections will receive a visible revision note and version update.

CONTENTS · NE-003

দশটি পরিচিত অজুহাত

0□	“কাল থেকে বদলাব...”	□
0□	“সবাই তো করে...”	□□
0□	“এটা তো ছোট গুনাহ...”	□□
0□	“আল্লাহ তো ক্ষমাশীল...”	□□
0□	“আমি তো কারও ক্ষতি করছি না”	□□
0□	“নিয়ত তো ভালো”	□□
0□	“সময়ই পাই না...”	□□
0□	সবাই তো করছে...	□□
0□	মানুষ কী বলবে?	□□
□□	“ঈমান তো হৃদয়ে আছে...”	□□

HOW TO READ

এই বইটি কীভাবে পড়বেন

প্রতিটি অধ্যায়ে একটি অজুহাত আছে। পড়ার সময় অন্য কারও কথা ভাবার আগে নিজের ভেতরে বাক্যটি কোথায় ব্যবহার করি সেটা খুঁজুন। তারপর একটি ছোট corrective action বেছে নিন—আজই, যতটা বাস্তবভাবে সম্ভব।

“কাল থেকে বদলাব…”

আমাদের অনেকের জীবনেই একটা খুব পরিচিত বাক্য আছে।

“কাল থেকে নামাজটা নিয়মিত করব…”
“কাল থেকে কুরআন পড়া শুরু করব…”
“কাল থেকে এই গুনাহটা ছাড়ব…”
“কাল থেকে ফজরে উঠব…”
“কাল থেকে বদলে যাব…”

শুনতে harmless লাগে।
কারও সঙ্গে ঝগড়া নেই, কোনো কুফরি কথা নয়, প্রকাশ্য বিদ্রোহও নয়। বরং বাক্যটা দেখে মনে হয়—মানুষটা ভালোই তো, দ্বীনের কথা ভাবছে, বদলাতেও চায়।

কিন্তু সমস্যাটা এখানেই।

শয়তান অনেক সময় মানুষকে সরাসরি “দ্বীন ছেড়ে দাও” বলে না।
সে শুধু বলে—

“এখন না… একটু পরে।”

আর নফস সেই কথাই খুব পছন্দ করে।
কারণ “না” বললে মানুষ ভয় পায়, কিন্তু “পরে” বললে অন্তর কিছুটা শান্ত থাকে।
মানুষ ভাবে, “আমি তো অস্বীকার করছি না, শুধু একটু delay করছি।” অথচ এই delay-টাই অনেক সময় পুরো জীবনকে খেয়ে ফেলে।

আজ যে তাওবাটা করা দরকার ছিল, সেটা কাল পর্যন্ত যায়।

কালের পর পরশু।

তারপর “একটু জীবন গুছিয়ে নেই।”

তারপর “এই phase টা শেষ হোক।”

তারপর “সময় হলে করব।”

তারপর একদিন বুঝা যায়—বদলানোর ইচ্ছাটা ছিল, কিন্তু বদলানোটা আর হলো না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন দেখে সে আগামীকালের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে।”

(সূরা আল-হাশর, ৫৯:১৮)

এখানে “আগামীকাল” বলতে আখিরাতকে বোঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ একজন মুমিনের কাজ হলো কাল্পনিক future-এর ওপর ভরসা করে বসে থাকা নয়; বরং আজ থেকেই আখিরাতের জন্য পাঠানো।

আজকের সালাত, আজকের তাওবা, আজকের ইস্তিগফার, আজকের কুরআন, আজকের গুনাহ ছেড়ে দেওয়া—এসবই তো আগামীকালের জন্য পাঠানো পাথেয়।

কিন্তু নফসের অজুহাত কী?

“আরও একটু পরে...”

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

“আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করো তোমাদের কারও কাছে মৃত্যু আসার আগে। তখন সে বলবে, ‘হে আমার রব! তুমি যদি আমাকে আরও সামান্য সময় পর্যন্ত অবকাশ দিতে...’”
(সূরা আল-মুনাফিকূন, ৬৩:১০)

এই আয়াত মানুষকে একটা ভয়ংকর সত্য মনে করিয়ে দেয়—
আজ আমরা যে “আরও একটু পরে” বলছি, মৃত্যুর সময় আমরা উল্টো বলব—
“আরও একটু সময় যদি পেতাম...”

আজ আমরা সময়কে cheap ভাবছি।
সেদিন সময় হবে সবচেয়ে দামী জিনিস।
আজ আমরা বদলানো পিছিয়ে দিচ্ছি।
সেদিন ফিরে আসতে চাইব, কিন্তু আর সুযোগ থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত—সুস্থতা এবং অবসর।”
(সহিহ বুখারি, ৬৪১২)

এই হাদীসটা শুধু health tip না।
এটা procrastination-এর বিরুদ্ধে একটা গভীর আঘাত।
আমরা ভাবি—যখন সময় হবে, তখন শুরু করব।
অথচ সময় তো এখনই আছে।

আমরা ভাবি—যখন মন fresh থাকবে, তখন কুরআন পড়ব।
অথচ free সময়টুকু scrolling-এ চলে যাচ্ছে।
আমরা ভাবি—যখন environment ভালো হবে, তখন বদলাব।
অথচ জানিই না, সেই environment আদৌ আসবে কি না।

সত্যি কথা হলো—
“কাল থেকে” অনেক সময় sincere plan না,
বরং নফসের polished excuse।

অবশ্যই planning করা খারাপ না।
আপনি যদি বলেন, “আগামীকাল সকাল ৭টায় ওঠে আমি এই আমল শুরু করব”—
এটা পরিকল্পনা হতে পারে।
কিন্তু আপনি যদি শুধু vague ভাবে বারবার বলেন, “কাল থেকে ঠিক হব,” অথচ আজ কোনো ছোট পদক্ষেপও না নেন—তাহলে বুঝতে হবে, এটা commitment না; এটা delay।

তাহলে করণীয় কী?

প্রথমত, “কাল” শব্দটাকে “আজ” দিয়ে বদলান।
পুরো জীবন একদিনে পাল্টাতে হবে না।
কিন্তু আজ একটি ছোট কাজ শুরু করুন।

আজই দুই রাকাআত সালাতুত তাওবা পড়ুন।
আজই ১০ আয়াত কুরআন পড়ুন।
আজই একটা haram page unfollow করুন।

আজই একটা গুনাহ থেকে সরে আসুন।
আজই ফজরের জন্য alarm দিন।
আজই কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে sorry বলুন।

দ্বিতীয়ত, perfect moment-এর অপেক্ষা বন্ধ করুন।
অনেকেই ভাবে—"মনের অবস্থা ভালো হলে শুরু করব।"
কিন্তু ইবাদত শুরু করলে মন ভালো হয়; মন ভালো হলে তবেই ইবাদত শুরু হয়—
এমন না।

তৃতীয়ত, নিজের কাছে honest হন।
আপনি সত্যিই কি সময় পান না?
নাকি priority দেন না?
আপনি সত্যিই কি দুর্বল?
নাকি অজুহাত দিচ্ছেন?
এই প্রশ্নগুলো uncomfortable, কিন্তু দরকারি।

চতুর্থত, তাওবাকে future project বানাবেন না।
গুনাহ থেকে ফিরে আসা এমন কিছু না, যা retirement-এর পর করা যাবে।
তাওবা delayed করলে অন্তর ধীরে ধীরে গুনাহের সঙ্গে মানিয়ে নেয়।

পঞ্চমত, মনে রাখুন—বদলানো বড় ঘোষণা দিয়ে নয়, ছোট consistency দিয়ে হয়।
যে মানুষ আজ একটি sincere step নেয়, সে-ই কাল বড় পরিবর্তন দেখতে পায়।

আজ নিজেকে একটা প্রশ্ন করুন—

আমি কতদিন ধরে একই কথা বলছি—

“কাল থেকে...”

নামাজের ক্ষেত্রে?

পর্দার ক্ষেত্রে?

তাওবার ক্ষেত্রে?

কুরআনের ক্ষেত্রে?

একটা নির্দিষ্ট গুনাহ ছাড়ার ক্ষেত্রে?

জীবন গুছিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে?

আপনি হয়তো খেয়াল করবেন—

আপনার জীবনের সবচেয়ে dangerous word হয়তো কোনো হারাম শব্দ না।

বরং খুব সাধারণ একটি শব্দ—

“কাল”

মনে রাখুন,

শয়তান খুশি হয় শুধু তখন না, যখন আপনি গুনাহ করেন।

সে তখনও খুশি হয়, যখন আপনি সৎ কাজটা করতে করতে আরেক দিন পেছান।

কারণ সে জানে—

সবাইকে সরাসরি থামানো যায় না।

অনেককে শুধু দেরি করিয়ে দিলেই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নফসের ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন। আমাদেরকে “একদিন” এর মানুষ না বানিয়ে “আজ” থেকেই ফেরত আসা মানুষের দলে শামিল করুন। আমাদের তাওবাকে delayed না করে accepted করুন, আর আমাদের

জীবনের বাকি সময়কে আপনার সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করার তাওফিক দিন।

আমিন।

১. “কাল থেকে” — এই কথাতেই অনেক জীবন আটকে আছে।

২. শয়তান সবসময় “না” বলে না, অনেক সময় বলে “পরে”।

৩. তাওবা delay করাও এক ধরনের ক্ষতি।

৪. বদল শুরু হয় আজকের ছোট step থেকে।

৫. আপনার জীবনের সবচেয়ে dangerous “কাল” কোনটা?

“কাল থেকে” mentality ভাঙার ৫টি উপায়

১. বড় target না, আজকের ছোট আমল ঠিক করুন।

২. vague plan বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট time fix করুন।

৩. এক গুনাহ চিহ্নিত করে আজ থেকেই stop button চাপুন।

৪. ফ্রি সময়ের হিসাব লিখে দেখুন—সময় নেই, নাকি priority নেই।

৫. প্রতিরাতে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: “আজ আমি কীসের জন্য বদলাইনি?”

“সবাই তো করে...”

আমাদের নফসের আরেকটা খুব পরিচিত অজুহাত হলো—

“সবাই তো করে...”

গান শুনি?

সবাই তো শুনে।

নন মাহরামের সঙ্গে unnecessary কথা?

এখনকার যুগে সবাই তো করে।

হারাম relationship?

এখন তো এগুলো normal।

পর্দায় ঢিলেমি?

আমার আশেপাশে সবাই তো এমন।

নামাজে অলসতা?

অনেকেই তো পড়ে না।

গীবত, রাগ, অহংকার, চোখের গুনাহ, মিথ্যা excuse, social media-র haram content—

প্রতিটা জায়গায় নফস একটা কথা খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেয়—

“আমি একা তো করছি না, সবাই করছে।”

কথাটা শুনতে logical মনে হয়।
কারণ মানুষ ভিড় দেখে সাহস পায়।
যে কাজ একা করতে লজ্জা লাগত, সেটা অনেক মানুষ করছে দেখলে সহজ লাগে।
যে গুনাহ আগে অপরাধ মনে হতো, সেটা চারপাশে ছড়িয়ে গেলে normal মনে হয়।

কিন্তু একটা কঠিন সত্য হলো—

কোনো কাজ মানুষের কাছে normal হলেই আল্লাহর কাছে halal হয়ে যায় না।

সমাজ বদলাতে পারে।
Trend বদলাতে পারে।
মানুষের রুচি বদলাতে পারে।
কিন্তু আল্লাহর হালাল হারাম মানুষের সংখ্যা দেখে বদলায় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

“আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করেন, তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে।”
সূরা আল আনআম, ৬:১১৬

এই আয়াত আমাদের একটা বড় reality check দেয়।

সত্য সবসময় majority-এর সঙ্গে থাকে না।

অনেক মানুষ কোনো কাজ করছে মানেই সেটা সঠিক নয়।

Popular হওয়া আর accepted by Allah হওয়া এক জিনিস না।

আল্লাহ আরও বলেন—

قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

“বলুন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্র জিনিসের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে।”

সূরা আল মায়িদাহ, ৫:১০০

কী গভীর কথা!

খারাপ জিনিস অনেক বেশি হতে পারে।

খারাপ content বেশি হতে পারে।

খারাপ অভ্যাস বেশি ছড়াতে পারে।

হারাম সম্পর্ক বেশি দেখা যেতে পারে।

ভুল lifestyle বেশি popular হতে পারে।

কিন্তু বেশি হওয়া কখনো ভালো হওয়ার প্রমাণ না।

আজ social media-তে একটা গুনাহ হাজার হাজার মানুষ করছে।

Comments-এ সবাই হাসছে।

Reels-এ সবাই share করছে।

বন্ধুদের মধ্যে সবাই এটাই normal বলছে।

তাই আমার নফসও শান্ত হয়ে যায়।

কিন্তু কিয়ামতের দিন প্রশ্ন হবে না—

“তোমার বন্ধুরা কী করত?”

প্রশ্ন হবে—

“তুমি কী করেছিলে?”

সেদিন crowd আলাদা হয়ে যাবে।
Trend আলাদা হয়ে যাবে।
বন্ধু আলাদা হয়ে যাবে।
Screen আলাদা হয়ে যাবে।
শুধু আমি, আমার আমল আর আমার রবের সামনে দাঁড়ানো থাকবে।

তখন আমি বলতে পারব না—

“ইয়া আল্লাহ, সবাই তো করত...”

কারণ আল্লাহ আমাকে চোখ দিয়েছিলেন আমার নিজের জন্য।
কান দিয়েছিলেন আমার নিজের জন্য।
অন্তর দিয়েছিলেন আমার নিজের জন্য।
ইচ্ছাশক্তি দিয়েছিলেন আমার নিজের জন্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর—এসবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।”
সূরা আল ইসরা, ১৭:৩৬

খেয়াল করুন—

এখানে বলা হয়নি, “সমাজকে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

বলা হয়েছে, আমার কান, আমার চোখ, আমার অন্তর সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

তাই “সবাই করে” বলে নিজের দায় সরানো যায় না।

একটা উদাহরণ ভাবুন।

একটা রাস্তা ভুল দিকে যাচ্ছে।

হাজার মানুষ সেই পথে হাঁটছে।

আমি কি শুধু ভিড় দেখে বলব—“এত মানুষ যাচ্ছে, নিশ্চয়ই ঠিক?”

না।

আমি দেখব গন্তব্য কোথায়।

কারণ ভুল পথে মানুষ বেশি হলেও পথটা ভুলই থাকে।

দ্বীনের ক্ষেত্রেও তাই।

যে fashion আল্লাহর অপছন্দের, সেটা সবাই করলে halal হয় না।

যে সম্পর্ক haram, সেটা culture করলে জায়েজ হয় না।

যে content চোখকে নষ্ট করে, সেটা viral হলে পবিত্র হয় না।

যে কথা গীবত, সেটা “group discussion” নাম দিলেও গীবতই থাকে।

যে earning হারাম, সেটা market standard হলেও হারামই থাকে।

আমরা অনেক সময় গুনাহ করতে করতে ভয় পাই না, কারণ আশেপাশে সবাই করছে।

কিন্তু একজন মুমিনের scale মানুষ না।

একজন মুমিনের scale হলো—

আল্লাহ কী বলেছেন?
রাসূল ﷺ কী শিখিয়েছেন?
আমার অন্তর আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত তো?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত অবস্থায়, আবার তা অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে।
সুতরাং সুসংবাদ সেই অপরিচিতদের জন্য।”
সহিহ মুসলিম

এই হাদীস আমাদের শেখায়—
সত্য পথে থাকতে গেলে কখনো কখনো মানুষ আপনাকে strange ভাববে।
সবাই যেদিকে যাচ্ছে, আপনি সেদিকে না গেলে আপনাকে boring বলা হতে পারে।
আপনি হারাম relationship এড়ালে backward বলা হতে পারে।
আপনি পর্দা করলে extreme বলা হতে পারে।
আপনি গীবত থেকে চুপ থাকলে mood নষ্টকারী বলা হতে পারে।
আপনি নামাজের জন্য উঠলে over religious বলা হতে পারে।

কিন্তু মনে রাখবেন—

মানুষের চোখে strange হওয়া ভয়ংকর না।
আল্লাহর কাছে হারিয়ে যাওয়া ভয়ংকর।

তাহলে কীভাবে এই অজুহাত থেকে বাঁচব?

প্রথমত, নিজের মুখ থেকে “সবাই তো করে” বাক্যটা ধরুন।
যখনই এই কথা মনে আসে, বুঝবেন নফস justification খুঁজছে।

দ্বিতীয়ত, প্রশ্ন বদলান।
“সবাই করে কি না” না।
প্রশ্ন করুন—

“আল্লাহ এটা পছন্দ করেন কি না?”

তৃতীয়ত, নিজের environment বদলান।
আপনি যদি সবসময় এমন মানুষের মধ্যে থাকেন যারা গুনাহকে normal বানিয়ে দেয়, তাহলে আপনার অন্তরও একসময় সেটাকে normal ভাববে।

চতুর্থত, social media diet ঠিক করুন।
আপনার feed যদি আপনাকে haram normal দেখায়, তাহলে আপনার অন্তরও ধীরে ধীরে halal haram-এর sensitivity হারাবে।

পঞ্চমত, ছোট ছোট জায়গায় আলাদা দাঁড়ানোর practice করুন।
সব জায়গায় বড় ঘোষণা দিতে হবে না।
কখনো শুধু scroll বন্ধ করা।
কখনো শুধু group chat থেকে বের হওয়া।
কখনো শুধু “না, এটা ঠিক না” বলা।
কখনো শুধু কোনো haram trend follow না করা।

হয়তো মানুষ বলবে—

“এত serious হওয়ার কী আছে?”

আপনি মনে মনে বলুন—

“কিয়ামতের দিন আমাকেই জবাব দিতে হবে।”

ভাই বোনেরা,
এই দুনিয়ায় অনেক কিছু normal হয়ে গেছে।
কিন্তু মুমিনের কাজ normal হওয়া না।
মুমিনের কাজ হলো আল্লাহর কাছে accepted হওয়া।

যে যুগে মানুষ গুনাহকে lifestyle বানিয়ে ফেলে, সে যুগে আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করাটাই এক বড় জিহাদ।

আজ নিজেকে জিজ্ঞেস করি—

আমি কোন গুনাহকে শুধু এই কারণে হালকা ভাবছি যে সবাই করছে?

আমার কোন অভ্যাসটা সমাজ normal বানিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর সামনে সেটার উত্তর কঠিন হবে?

আমি কি সত্যকে follow করছি—
নাকি crowd-কে?

আল্লাহ আমাদেরকে মানুষের ভিড়ের ধোঁকা থেকে বাঁচান। আমাদের অন্তরে হককে হক হিসেবে চিনে তা অনুসরণ করার তাওফিক দিন, আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিনে তা থেকে দূরে থাকার শক্তি দিন। মানুষ হাসলেও, মানুষ না মানলেও, trend বিপরীতে গেলেও আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টির পথে দৃঢ় রাখুন।

আমিন।

ছোট গুনাহকে ছোট ভাবতে ভাবতেই অন্তর অসাড় হয়ে যায়।

১. মানুষ বেশি করলেই কোনো ভুল ঠিক হয়ে যায় না।

২. Popular হওয়া আর আল্লাহর কাছে accepted হওয়া এক জিনিস না।

৩. “সবাই করে” কিয়ামতের দিন অজুহাত হবে না।

৪. মুমিনের scale সমাজ না—আল্লাহর বিধান।

৫. কোন গুনাহটা আমরা “normal” বলে হালকা বানিয়ে ফেলেছি?

“সবাই তো করে” অজুহাত ভাঙার ৫টি self-check

১. এই কাজটা যদি কেউ না করত, আমি কি তখনও করতাম?

২. এটা কি আল্লাহর সামনে বলতে পারব?

৩. এটা কি আমার চোখ, কান বা অন্তরকে নষ্ট করছে?

৪. আমি কি evidence দেখছি, নাকি শুধু culture follow করছি?

৫. এটা popular, কিন্তু এটা কি halal?

“এটা তো ছোট গুনাহ...”

“একটু দেখলে কী হবে?”

“একবার মিথ্যা বললাম, এত বড় বিষয় না।”

“সামান্য গীবতই তো।”

“একটু কথা বলছি, খারাপ কিছু তো করছি না।”

“এটা তো ছোট গুনাহ...”

এই বাক্যটা আমাদের অন্তরকে খুব দ্রুত শান্ত করে দেয়।

গুনাহটা ছাড়তে হবে না।
তাওবার প্রয়োজন অনুভব করতে হবে না।
নিজেকে সংশোধনও করতে হবে না।

শুধু কাজটার সামনে একটা শব্দ বসিয়ে দিলাম—

“ছোট।”

তারপর মনে হলো, বিষয়টা আর গুরুত্ব দেওয়ার মতো নেই।

কিন্তু একটু ভেবে দেখুন—

একটা গুনাহ ছোট হতে পারে, কিন্তু আমরা কাকে অমান্য করছি?

যাঁর নিয়ামত নিয়ে বেঁচে আছি, যাঁর দেওয়া চোখ দিয়ে দেখছি, কান দিয়ে শুনছি, হাত দিয়ে লিখছি—অবাধ্যতা তো সেই আল্লাহরই হচ্ছে।

এর অর্থ এই নয় যে শরিয়তে ছোট ও বড় গুনাহের কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য অবশ্যই আছে। সব গুনাহের বিধান ও ভয়াবহতাও সমান নয়।

সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন "ছোট গুনাহ" কথাটাকে আমরা "গুরুত্বহীন গুনাহ" বানিয়ে ফেলি।

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনের আমলনামার কথা জানিয়ে বলেন—

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا

"আমলনামা সামনে রাখা হবে। তখন তারা বলবে, 'এ কেমন আমলনামা! এটি ছোট কিংবা বড় কিছুই হিসাবের বাইরে রাখেনি।'"
— সূরা আল-কাহফ, ১৮:৪৯

খেয়াল করুন, আয়াতে শুধু বড় কাজের কথা বলা হয়নি।

ছোট ও বড়—সবই লেখা হচ্ছে।

যে কথাটা বলার পর ভুলে গেছি।
যে দৃশ্যটা কয়েক সেকেন্ড দেখেছি।
যে comment দিয়ে কাউকে কষ্ট দিয়েছি।
যে ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে কথা বলেছি।
যে মিথ্যাকে "সামান্য অজুহাত" বলেছি।

আমরা ভুলে যেতে পারি।

কিন্তু আমলনামা ভুলে যায় না।

ছোট গুনাহের আরেকটি বিপদ হলো—এটি অনেক সময় একা থাকে না।

আজ একবার।

কাল আবার।

তারপর নিয়মিত।

এরপর আর অপরাধবোধও থাকে না।

যে কাজটি প্রথমবার করার পর অন্তর কেঁপেছিল, কয়েক মাস পর সেটিই দৈনন্দিন অভ্যাস হয়ে যায়। তখন মানুষ শুধু গুনাহ করছে না—গুনাহের প্রতি তার সংবেদনশীলতাও হারিয়ে যাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করেছেন—

“তোমরা তুচ্ছ মনে করা গুনাহগুলো থেকে সাবধান হও। কারণ সেগুলো মানুষের ওপর জমতে জমতে একসময় তাকে ধ্বংস করে দেয়।”
— মুসনাদ আহমাদ, ৩৮১৮; সহিহুল জামি’, ২৬৮৭

একটি ছোট শুকনো ডাল হয়তো চুলা জ্বালানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

কিন্তু সবাই যদি একটি করে ডাল জমা করে, একসময় বড় আগুন জ্বলে ওঠে।

ছোট গুনাহও অনেক সময় এমন।

একটি চোখের গুনাহ।

একটি অপ্রয়োজনীয় message।

একটি গীবতের বাক্য।

একটি মিথ্যা।

একটি সালাত দেরি করা।

একটি হারাম ভিডিও।

আলাদা করে দেখলে সামান্য মনে হয়।

কিন্তু প্রতিদিনের সবগুলো এক জায়গায় জমলে—সেটাই অন্তরের ওপর ভার হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“বরং তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে।”

— সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩:১৪

মরিচা সাধারণত একদিনে পুরো লোহাকে ঢেকে ফেলে না।

অল্প অল্প করে জমে।

অন্তরের ক্ষেত্রেও তাই।

গুনাহের পর তাওবা না করলে, অনুতপ্ত না হলে, বরং বারবার সেটাকে হালকা বানালে—অন্তরের ওপর দাগ জমতে থাকে।

একসময় কুরআন শুনেও আগের মতো অনুভব হয় না।

নসিহাহ শুনলে বিরক্ত লাগে।

হারাম সামনে এলেও চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার শক্তি থাকে না।

কারণ সমস্যাটা তখন শুধু একটি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। গুনাহটা অন্তরের স্বাভাবিকতার অংশ হয়ে গেছে।

আরও একটি বিষয় লক্ষ করা দরকার।

মানুষ সাধারণত বড় গুনাহ করার আগে কিছুটা ভয় পায়। কিন্তু ছোট মনে করা গুনাহের ক্ষেত্রে সতর্কতাই থাকে না।

তাই বড় গুনাহ থেকে দূরে থাকা একজন মানুষও ছোট ছোট দরজা দিয়ে প্রতিদিন নিজের অন্তরে ক্ষতি ঢুকতে দিতে পারে।

তবে এখানে ভারসাম্য জরুরি।

ইসলাম আমাদের প্রতিটি সামান্য ভুল নিয়ে হতাশা ও আতঙ্কে ডুবে থাকতে শেখায় না। আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু'আহ থেকে পরবর্তী জুমু'আহ এবং এক রমাদান থেকে পরবর্তী রমাদান—মাঝের গুনাহগুলোর কাফফারা হয়, যদি বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।

অর্থাৎ মুমিনের পথ হতাশার পথ নয়।

মুমিনের পথ হলো—

ভুল হলে স্বীকার করা।
তাওবা করা।
ইস্তিগফার করা।

ভালো আমল বাড়ানো।

এবং একই ভুলকে অজুহাত দিয়ে আঁকড়ে না থাকা।

সমস্যা ভুল হয়ে যাওয়া নয়।

সমস্যা হলো—

ভুলের পরও মনে করা, “এতে কিছু হবে না।”

সমস্যা দুর্বল হয়ে পড়ে যাওয়া নয়।

সমস্যা হলো—

পড়ে থাকার জন্য গুনাহের আকারকে অজুহাত বানানো।

তাহলে এই আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে কীভাবে বের হব?

প্রথমত, “ছোট গুনাহ” ও “গুরুত্বহীন গুনাহ”কে এক ভাববেন না।

বিধানে ছোট হতে পারে, কিন্তু হিসাবের বাইরে নয়।

দ্বিতীয়ত, গুনাহের আকার নয়, তার পুনরাবৃত্তি দেখুন।

যে কাজটি “একবার” বলে শুরু হয়েছিল, সেটি কি এখন নিয়মিত হয়ে গেছে?

তৃতীয়ত, কাজটির পর অন্তরের অবস্থা দেখুন।

অনুতপ্ত হচ্ছেন, নাকি নির্লজ্জতা বাড়ছে? ভয় কমছে, নাকি তাওবার ইচ্ছা জাগছে?

চতুর্থত, ছোট গুনাহের দরজাটা দ্রুত বন্ধ করুন।

যে account চোখের গুনাহ বাড়ায়, unfollow করুন।

যে chat সীমা ভাঙায়, থামিয়ে দিন।

যে পরিবেশ গীবত করায়, সেখান থেকে উঠে আসুন।

যে অভ্যাস সালাত পিছিয়ে দেয়, সেটায় সীমা দিন।

পঞ্চমত, ভুলের পর সঙ্গে সঙ্গে একটি ভালো কাজ করুন।

ইস্তিগফার করুন।

দুই রাকাআত তাওবার সালাত পড়ুন।

সদকা করুন।

কাউকে কষ্ট দিলে ক্ষমা চান।

গুনাহের জায়গায় একটি ভালো অভ্যাস বসান।

আজ একটু নিজের জীবন দেখুন।

কোন কাজটাকে আপনি বহুদিন ধরে “ছোট” বলে ছাড়ছেন না?

চোখের কোনো গুনাহ?

কথার কোনো গুনাহ?

ফোনের কোনো গোপন অভ্যাস?

সালাতে নিয়মিত অবহেলা?

কারও সম্পর্কে বলা কয়েকটি বাক্য?

মনে রাখবেন—

পাহাড় শুধু বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি হয় না। অসংখ্য ছোট কণাও একত্র হয়ে পাহাড় তৈরি করে।

তাই গুনাহ ছোট বলে হতাশ হবেন না।

কিন্তু ছোট বলে অবহেলাও করবেন না।

আল্লাহর রহমতের আশা নিয়ে তাওবা করুন, এবং আজই একটি দরজা বন্ধ করুন।

আল্লাহ আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব গুনাহ ক্ষমা করুন। যেসব ভুলকে আমরা হালকা মনে করছি, সেগুলোর ক্ষতি বুঝতে দিন। আমাদের অন্তরকে গুনাহের প্রতি নির্লজ্জ নয়, সংবেদনশীল রাখুন এবং প্রতিবার পড়ে যাওয়ার পর দ্রুত তাঁর দিকে ফিরে আসার তাওফিক দিন।

আমিন।

আল্লাহর রহমতকে আশা বানাচ্ছি, নাকি গুনাহের অনুমতি?

১. গুনাহ ছোট হতে পারে, কিন্তু হিসাবের বাইরে নয়।
২. একবারের ভুল যখন অভ্যাস হয়, তখন বিপদ বাড়ে।
৩. সমস্যা শুধু পড়ে যাওয়া নয়—পড়ে থাকার অজুহাত বানানো।
৪. ছোট গুনাহকে হালকা ভাববেন না, আবার আল্লাহর রহমত থেকেও নিরাশ হবেন না।
৫. কোন ভুলটাকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে “সামান্য” বলে এড়িয়ে যাচ্ছি?

- ছোট গুনাহ থেকে বাঁচার ৫টি বাস্তব পদক্ষেপ

১. বারবার করা একটি গুনাহ আজই চিহ্নিত করুন।

২. যে trigger গুনাহের দিকে নেয়, সেটি সরিয়ে দিন।

৩. ভুলের সঙ্গে সঙ্গে ইস্তিগফার ও তাওবা করুন।

৪. গুনাহের জায়গায় একটি ভালো অভ্যাস বসান।

৫. রাতে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন—আজ কোন ভুলকে আমি হালকা ভেবেছি?

“আল্লাহ তো ক্ষমাশীল…”

“একটু গুনাহ করলে কী হবে? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল।”

“এখন করি, পরে তাওবা করে নেব।”

“আল্লাহ এত দয়ালু, তিনি নিশ্চয়ই মাফ করে দেবেন।”

কথাটি মিথ্যা নয়। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাঁর রহমত এত বিশাল যে কোনো গুনাহগার আন্তরিকভাবে ফিরে এলে তার জন্য হতাশ হওয়ার সুযোগ নেই।

কিন্তু বিপদ শুরু হয় তখন, যখন আমরা আল্লাহর রহমতকে ফিরে আসার সাহস হিসেবে ব্যবহার না করে গুনাহ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি হিসেবে ব্যবহার করি।

তখন কথাটি আর আশা থাকে না।
সেটি হয়ে যায় নফসের সাজানো অজুহাত।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জানাতে বলেছেন যে তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ঠিক পরের আয়াতেই জানিয়েছেন, তাঁর শাস্তিও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। অর্থাৎ কুরআন আমাদের শুধু আশা দেয় না, দায়িত্বশীল ভয়ও শেখায়।

আমরা অনেক সময় প্রথম কথাটি মনে রাখি—

“আল্লাহ ক্ষমাশীল।”

কিন্তু পরের সতর্কতাটি ভুলে যাই—

“তাঁর শাস্তিও কঠিন।”

এই ভারসাম্য হারিয়ে গেলে মানুষ দুই ধরনের বিপদে পড়ে। কেউ নিজের গুনাহ দেখে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ে যায়। আবার কেউ রহমতের কথা বলে গুনাহকে হালকা করতে থাকে।

দুটোই ভুল।

আল্লাহ বলেন—

“হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।”
— সূরা আয-যুমার, ৩৯:৫৩

এটি নিঃসন্দেহে আশার আয়াত। কিন্তু পরের আয়াতেই বলা হয়েছে—

“তোমাদের ওপর শাস্তি আসার আগেই তোমরা তোমাদের রবের দিকে ফিরে এসো এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো।”
— সূরা আয-যুমার, ৩৯:৫৪

খেয়াল করুন, আল্লাহর রহমতের ঘোষণা শুনে করণীয় হিসেবে বলা হয়নি—

“তাই নিশ্চিন্তে গুনাহ করতে থাকো।”

বলা হয়েছে—

“ফিরে এসো।”

রহমতের সঠিক প্রতিক্রিয়া হলো তাওবা।
রহমতের অপব্যবহার হলো গুনাহ চালিয়ে যাওয়া।

একজন মানুষ ভুল করে ফেলল, তারপর লজ্জিত হয়ে বলল, “আমার রব ক্ষমাশীল, আমি তাঁর কাছে ফিরে যাব”—এটি ঈমানদারের আশা।

আরেকজন জেনেশুনে একই গুনাহ করতে থাকল এবং বলল, “সমস্যা নেই, আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন”—এটি নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভিত্তিহীন নিশ্চয়তা।

আল্লাহ সতর্ক করেছেন—

“দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং প্রতারক যেন আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের প্রতারিত না করে।”
— সূরা লুকমান, ৩১:৩৩

আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত হওয়ার একটি রূপ হলো—তাঁর রহমতের কথা মনে রেখে তাঁর হিসাব, সতর্কতা ও শাস্তির কথা ভুলে যাওয়া।

আমরা কি কখনো কোনো মানুষের সঙ্গে এমন করি?

কেউ যদি খুব দয়ালু হয়, তাহলে কি বারবার তাকে কষ্ট দিয়ে বলি, “তিনি তো ভালো মানুষ, কিছু বলবেন না”?

বরং তাঁর দয়া অনুভব করলে কৃতজ্ঞতা বাড়ার কথা। তাকে কষ্ট দিতে আরও সংকোচ হওয়ার কথা।

তাহলে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করে, তাঁর ক্ষমাশীলতার কথা জেনে আমাদের অবাধ্যতা কীভাবে আরও সহজ হয়ে যায়?

আল্লাহর দয়া আমাকে গুনাহে সাহসী করবে না।
বরং তাওবায় সাহসী করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন, আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধকে অতিক্রম করেছে।

এই হাদিস গুনাহগারের জন্য অসীম আশার দরজা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে থাকবে। বরং অর্থ হলো—যত বড় ভুলই হোক, সত্যিকারভাবে ফিরে আসার দরজা বন্ধ ভাববে না।

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন ভারসাম্য শিখিয়েছেন যে একজন মুমিন যদি আল্লাহর শাস্তির পূর্ণ বাস্তবতা জানত, তবে সে অত্যন্ত ভীত হতো; আর একজন অবিশ্বাসী যদি আল্লাহর রহমতের বিশালতা জানত, তবে সে হতাশ হতো না।

অর্থাৎ মুমিনের অন্তরে দুইটিই থাকবে—

আশা এবং ভয়।

শুধু ভয় থাকলে মানুষ হতাশ হয়ে যেতে পারে।
শুধু আশা থাকলে মানুষ বেপরোয়া হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আশা যদি বলে, “ফিরে এসো”, আর ভয় যদি বলে, “আর দেরি কোরো না”—তাহলেই অন্তর সঠিক পথে থাকে।

আপনি রহমতের আশা করছেন, নাকি অজুহাত বানাচ্ছেন?

কয়েকটি প্রশ্নে নিজেকে পরীক্ষা করুন।

গুনাহের পর “আল্লাহ ক্ষমাশীল” মনে হলে আপনার অন্তরে কি তাওবার ইচ্ছা জাগে, নাকি আবার একই কাজ করার সাহস আসে?

আপনি কি ভুলটি বন্ধ করার চেষ্টা করছেন, নাকি ক্ষমার কথা বলে সেটাকে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিচ্ছেন?

আপনি কি লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরছেন, নাকি পরিকল্পনা করেই ভাবছেন —“আগে গুনাহ করি, পরে তাওবা করব”?

আন্তরিক তাওবা মানে মানুষ আর কখনোই দুর্বল হয়ে পড়বে না—এমন নয়। একজন মানুষ তাওবা করেও আবার পিছলে যেতে পারে। আবার তাওবা করবে, আবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু তার অন্তরে অন্তত গুনাহ ছাড়ার সত্যিকারের ইচ্ছা থাকবে।

অন্যদিকে, আগে থেকেই গুনাহ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে “পরে তাওবা করব” বলা তাওবার মানসিকতা নয়। কারণ কেউ জানে না তার সেই “পরে” আসবে কি না।

আল্লাহ মুমিনদের আন্তরিক তাওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাই আজ কোনো বড় ঘোষণা দরকার নেই। একটি গুনাহ চিহ্নিত করুন, যেটাকে দীর্ঘদিন ধরে আল্লাহর ক্ষমার কথা বলে হালকা বানিয়ে রেখেছেন।

হয়তো চোখের কোনো গুনাহ।
কোনো গোপন যোগাযোগ।
মিথ্যা বলা।
গীবত।
নামাজে অবহেলা।
হারাম উপার্জনের কোনো অংশ।
অথবা এমন কোনো অভ্যাস, যা শুধু আপনি এবং আল্লাহ জানেন।

আজ বলুন—

“আমার রব ক্ষমাশীল। তাই আমি হতাশ হব না। কিন্তু তিনি আমাকে দেখছেন। তাই আমি বেপরোয়াও হব না।”

আল্লাহর রহমতের সবচেয়ে সুন্দর প্রমাণ হলো, তিনি আজও আমাদের ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছেন।

এই সুযোগকে গুনাহের অনুমতিপত্র বানাবেন না।
এটাকে ঘরে ফেরার পথ বানান।

আল্লাহ আমাদের তাঁর রহমত থেকে কখনো নিরাশ না করুন। আবার তাঁর রহমতকে অবাধ্যতার অজুহাত বানানোর ধোঁকা থেকেও রক্ষা করুন। আমাদের গুনাহ চিনতে, লজ্জিত হতে, আন্তরিকভাবে তাওবা করতে এবং তাওবার ওপর অটল থাকতে সাহায্য করুন।

আমিন।

ভালো নিয়ত কি ভুল কাজকে সঠিক বানিয়ে দেয়?

১. আল্লাহর রহমত তাওবার সাহস দেয়, গুনাহের অনুমতি নয়।
২. “আল্লাহ ক্ষমাশীল” কথাটি সত্য, কিন্তু নফস এর ভুল ব্যবহার করতে পারে।
৩. আশা মানুষকে আল্লাহর দিকে ফেরায়; মিথ্যা নিরাপত্তা গুনাহে রেখে দেয়।
৪. হতাশ হবেন না, আবার বেপরোয়াও হবেন না।
৫. ক্ষমার আশা করছি, নাকি তাওবা পিছিয়ে দিচ্ছি?

- রহমতের আশা ও আত্মপ্রবঞ্চনার পার্থক্য

রহমতের আশা বলে: ভুল করেছি, এখনই ফিরে যাব।

আত্মপ্রবঞ্চনা বলে: এখন করি, পরে ফিরে আসব।

রহমতের আশা গুনাহের পর অনুতাপ তৈরি করে।

আত্মপ্রবঞ্চনা গুনাহের আগে নিরাপত্তা দেয়।

রহমতের আশা আচরণ বদলায়।

শুধু মুখের আশা একই ভুলকে চালিয়ে যায়।

“আমি তো কারও ক্ষতি করছি না”

নফসের অজুহাত | পর্ব ০৫

“আমি তো কারও ক্ষতি করছি না”

আমরা অনেক গুনাহকে খুব সহজে হালকা করে ফেলি এই একটি বাক্যে — “আমি তো কারও ক্ষতি করছি না।” মনে হয়, যেহেতু আমি কাউকে ঠকাচ্ছি না, কারও সম্পদ মেরে দিচ্ছি না, কারও গায়ে হাত তুলছি না, তাই কিছু ব্যক্তিগত ভুল, কিছু গোপন গুনাহ, কিছু “নিজের মতো” জীবনযাপন হয়তো তেমন সমস্যা না। কিন্তু এখানেই নফসের খুব সূক্ষ্ম একটা ধোঁকা আছে।

কারণ ইসলাম শুধু এই প্রশ্ন করে না যে, তুমি অন্যকে ক্ষতি করছ কি না। ইসলাম এই প্রশ্নও করে — তুমি নিজেকে কী বানাচ্ছ? তোমার অন্তরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আল্লাহর সাথে তোমার সম্পর্ককে কী অবস্থায় নামিয়ে আনছ? এমন অনেক গুনাহ আছে, যার আঘাত প্রথমে অন্যের ওপর না পড়লেও নিজের অন্তরের ওপর পড়ে, ঈমানের ওপর পড়ে, লজ্জাবোধের ওপর পড়ে, তাওবার অনুভূতির ওপর পড়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,
“বরং মানুষ নিজেই নিজের ব্যাপারে ভালো জানে, যদিও সে নানা অজুহাত পেশ করে।”
(সূরা আল-কিয়ামাহ, ১৪–১৫)

কী গভীর কথা। আমরা বাইরে যতই যুক্তি দাঁড় করাই না কেন, অন্তরের ভেতর আমরা জানি কোন কাজটা আল্লাহকে খুশি করছে আর কোনটা করছে না। আমরা জানি কোন জিনিসটা "ব্যক্তিগত পছন্দ" না, বরং "ব্যক্তিগত অবাধ্যতা"। আমরা জানি কোন স্ক্রলিং, কোন সম্পর্ক, কোন দৃষ্টি, কোন অভ্যাস, কোন লুকানো কাজ — আল্লাহর ভয় কমিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু নফস চায় না আমরা এটাকে গুনাহ হিসেবে দেখি। তাই সে একটা নরম বাক্য সামনে আনে: "আমি তো কারও ক্ষতি করছি না।"

কিন্তু গুনাহ কখনোই harmless না। গুনাহর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো — তা ধীরে ধীরে অন্তরকে অসাড় করে দেয়। প্রথমে যে কাজটা করতে ভয় লাগত, পরে সেটাই স্বাভাবিক লাগে। প্রথমে যে কনটেন্ট দেখে অস্বস্তি হতো, পরে সেটাই routine হয়ে যায়। প্রথমে যে অবহেলায় অনুতাপ হতো, পরে আর সেটাও হয় না। এভাবেই অন্তরের sensitivity কমতে থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,
"কখনোই না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে।"
(সূরা আল-মুতাফফিফীন, ১৪)

অর্থাৎ গুনাহ শুধু আমলনামায় লেখা কোনো সংখ্যা না; তা অন্তরের ভেতরেও দাগ ফেলে। বারবার অবাধ্যতা, বারবার অবহেলা, বারবার justification — সব মিলিয়ে হৃদয়ে মরিচা জমে। তখন সত্য শুনেও মন নড়ে না, নসিহা শুনেও চোখে পানি আসে না, কুরআন পড়েও হৃদয় কাঁপে না। তখন মানুষ ভাবে সমস্যা কিছুই হয়নি, অথচ সবচেয়ে বড় সমস্যাটা ভেতরেই হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা যখন একটি গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তাওবা করে, বিরত হয় এবং ক্ষমা চায়, তাহলে তার অন্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। আর যদি সে গুনাহ বাড়াতে থাকে, তাহলে দাগও বাড়তে

থাকে।

(জামে তিরমিযী, ৩৩৩৪)

এই হাদিসটা আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়, গুনাহর ক্ষতি সবসময় চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অন্তরে তা কাজ করতেই থাকে। তাই "আমি তো কারও ক্ষতি করছি না" — এটা আসলে নিরাপদ কথা না। কারণ আপনি হয়তো অন্যের ক্ষতি করছেন না, কিন্তু নিজের অন্তরকে দুর্বল করছেন, নিজের ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন, নিজের আখিরাতকে ঝুঁকির মুখে ফেলছেন।

আসলে একজন মুমিনের চিন্তা এমন হওয়া উচিত — এই কাজটা আল্লাহ পছন্দ করেন কি না? শুধু এটাই যথেষ্ট। কাজটা সমাজে খুব normal কি না, কাজটা private কি না, কাজটা অন্য কেউ জানে কি না — এগুলো secondary। মূল প্রশ্ন হলো, আল্লাহ জানেন কি না। আর তিনি তো অবশ্যই জানেন।

তাই নিজেকে আজ কিছু প্রশ্ন করা জরুরি। আমি যে কাজটাকে harmless ভাবছি, সেটা কি আমার নামাজের স্বাদ কমিয়ে দিচ্ছে না? সেটা কি আমার অন্তরের লজ্জা কমিয়ে দিচ্ছে না? সেটা কি আমাকে তাওবা পিছিয়ে দিতে শিখাচ্ছে না? সেটা কি আমাকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে না, যেখানে গুনাহ আর গুনাহ মনে হয় না?

ফিরে আসার পথ এখনো বন্ধ হয়নি। আজই শুরু করা যায়। আজই একটি গোপন গুনাহ চিহ্নিত করা যায়। আজই একটি trigger কেটে দেওয়া যায়। আজই আল্লাহর কাছে বলা যায় — "ইয়া আল্লাহ, আমি নিজেকে ধোঁকা দিয়েছি। আমাকে মাফ করুন, আমাকে ফিরিয়ে নিন, আমার অন্তরকে পরিষ্কার করে দিন।" মুমিনের সৌন্দর্য এখানেই — সে অজুহাত লালন করে না, সে ফিরে আসার পথ খোঁজে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নফসের ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন, গুনাহকে ছোট মনে করার রোগ থেকে বাঁচান, এবং আমাদের অন্তরকে তাওবা, লজ্জা ও তাকওয়ার আলোয় জীবিত রাখুন। আমিন।

কমেন্টে লিখতে পারেন: “ইয়া আল্লাহ, আমার অন্তরকে পরিষ্কার করে দিন।”

আগামী পর্ব ইন শা আল্লাহ:
নফসের অজুহাত | পর্ব ০৬ — “নিয়ত তো ভালো...”

“নিয়ত তো ভালো”

নাফসের অজুহাত | পর্ব ০৬

“নিয়ত তো ভালো”

নাফসের একটা খুব পরিচিত অজুহাত হলো, “নিয়ত তো ভালো।” অনেকেই মনে করেন, অন্তর পরিষ্কার থাকলেই হলো; কাজটা পুরোপুরি ঠিক না হলেও সমস্যা নেই। কেউ বলে, “আমি তো খারাপ উদ্দেশ্যে করছি না।” কেউ বলে, “মানুষকে সাহায্য করার জন্য করছি।” কেউ বলে, “পরিবারের ভালোর জন্য করছি।” আবার কেউ হারাম, সন্দেহজনক বা শরীয়তবিরোধী কিছু কাজকে এভাবেই নিজের কাছে হালকা করে ফেলে।

কিন্তু ইসলামে শুধু ভালো নিয়তই যথেষ্ট নয়। নিয়ত ভালো হতে হবে, আর কাজটাও সঠিক হতে হবে। কারণ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য আমলের ভেতরে ইখলাসও চাই, সুন্নাহ ও শরীয়তের অনুসরণও চাই। শুধু “আমি ভালো চেয়েছি” বললেই ভুল সঠিক হয়ে যায় না। কেউ যদি ভুল পথে হাঁটে, কিন্তু দাবি করে তার উদ্দেশ্য ভালো, তাহলে সেই ভালো উদ্দেশ্য তাকে ভুলের দায় থেকে মুক্ত করে না।

> **সম্পাদকীয় নোট:** এখানে বিশেষত ইবাদত ও শরঈ বিধানের প্রসঙ্গ বোঝানো হয়েছে—সৎ নিয়ত কোনো স্পষ্ট হারামকে হালাল করে না, আর ইবাদতে নিয়তের পাশাপাশি নববী নির্দেশনার অনুসরণও জরুরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

র

ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।”
সূরা আল কাহফ, আয়াত ১১০

এখানে আল্লাহ তাআলা শুধু অন্তরের দাবিকে যথেষ্ট বলেননি; বলেছেন, সৎকর্ম করতে হবে। অর্থাৎ আমলটাও সহিহ হতে হবে। ইখলাস থাকবে, আবার আমলও শরীয়তসম্মত হবে। এ দুটির একটিও বাদ গেলে মানুষ আত্মপ্রবঞ্চনায় পড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
“নিশ্চয়ই সব কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।”
সহিহ বুখারী, হাদিস ১; সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৯০৭

এই হাদিস আমাদের শেখায়, নিয়ত খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটিই পুরো কথা নয়। আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
“যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনী বিষয়ের মধ্যে এমন কিছু সংযোজন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”
সহিহ বুখারী, হাদিস ২৬৯৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৭১৮

অর্থাৎ নিয়ত ভালো হলেই কোনো কাজ কবুল হবে না, যদি তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ দেখানো পথের সঙ্গে না মেলে। খুব সহজভাবে বললে, ভালো নিয়ত খারাপ কাজকে ভালো বানায় না; বরং সহিহ নিয়ত এবং সহিহ আমল—দুটো মিলেই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতার পথ তৈরি করে।

আজ অনেক মানুষ নিজের ভুলকে “নিয়ত” দিয়ে ঢেকে রাখে। হারাম উপার্জন করে বলে, “পরিবারের জন্য করছি।” পর্দাহীনতা বা সীমালঙ্ঘনকে হালকা করে বলে, “মনে তো খারাপ কিছু নেই।” দ্বীনের বিধান অমান্য করে বলে, “আল্লাহ তো আমার অন্তর জানেন।” হ্যাঁ, আল্লাহ অন্তর জানেন—এটাই তো ভয় পাওয়ার কথা। কারণ তিনি জানেন, আমি সত্যিই তাঁর সন্তুষ্টি চাইছি, নাকি “ভালো নিয়ত” কথাটাকে নিজের নফসকে বাঁচানোর ঢাল বানিয়ে ফেলেছি।

আমাদের বুঝতে হবে, নফস খুব চালাক। সে সরাসরি সবসময় বলে না, “ভুল কাজ করো।” বরং বলে, “উদ্দেশ্য তো ভালো, এত কড়াকড়ি কেন?” এভাবেই মানুষ ধীরে ধীরে ভুলকে স্বাভাবিক বানিয়ে ফেলে। একসময় সে নিজের চোখেই নির্দোষ হয়ে যায়, অথচ আল্লাহর নিকট তার হিসাব অন্যরকম হতে পারে।

তাই নিজেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা দরকার। আমি যা করছি, তা কি সত্যিই শরীয়তসম্মত? আমি যে উদ্দেশ্যের কথা বলছি, সেটা কি সত্যিই আল্লাহর জন্য, নাকি নিজের মনকে শান্ত রাখার জন্য? আমি কি আমলকে সুন্নাহর মাপে যাচাই করছি, নাকি শুধু নিজের ব্যাখ্যায় হালাল-হারামের সীমা বানিয়ে নিচ্ছি?

একজন মুমিনের পথ হলো, নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা এবং আমলকে সংশোধন করা। শুধু ভেতর ভালো রাখার কথা নয়, বাহিরকেও আল্লাহর আনুগত্যে নিয়ে আসতে হবে। কারণ দ্বীন কেবল অনুভূতির নাম নয়; এটি বিশ্বাস, নিয়ত, আনুগত্য ও আমলের সমন্বিত জীবনব্যবস্থা।

আসুন, আজ থেকে “নিয়ত তো ভালো” এই অজুহাতে নিজেকে আর না ভোলাই। বরং শিখি—ভালো নিয়তকে সহিহ আমলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইখলাস দান করুন, সুন্নাহসম্মত আমলের তাওফিক দিন, এবং নফসের প্রতারণা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

পরের পর্বে ইন শা আল্লাহ: “সবাই তো এমন করছে” — নফসের আরেকটি প্রতারণামূলক অজুহাত।

১. নিয়ত ভালো হলেই কি কাজ কবুল হয়?

২. ভালো উদ্দেশ্য কি ভুল পথকে বৈধ বানায়?

৩. আমরা কি নফসকে “নিয়ত” দিয়ে বাঁচাই?

৪. আল্লাহ নিয়তও দেখেন, আমলও দেখেন।

৫. নিজেকে প্রশ্ন করুন: আমি কি সত্যিই শরীয়তের পথে আছি?

নিয়ত ও আমল ঠিক রাখার ৫টি নীতি

১. কোনো কাজের আগে দেখুন, এটা শরীয়তসম্মত কি না।

২. “আমি ভালো চাই” বলার আগে দেখুন, আল্লাহ কি এটাকে অনুমোদন করেছেন।

৩. সহিহ নিয়ত রাখুন, কিন্তু সুন্নাহবিরোধী পথ এড়িয়ে চলুন।

৪. নিজের ভুলকে সুন্দর নাম দিয়ে বৈধ বানাবেন না।

৫. নিয়মিত কুরআন-হাদিসের আলোকে নিজের কাজ যাচাই করুন।

“সময়ই পাই না...”

“সময়ই পাই না...”

“কুরআন পড়ার সময় পাই না।”

“সকাল সন্ধ্যার যিকির করার সময় হয় না।”

“ইসলাম সম্পর্কে শেখার ইচ্ছা আছে, কিন্তু জীবনটা এত ব্যস্ত!”

“একটু অবসর পেলে নামাজ, তাওবা, আমল সব ঠিক করে ফেলব।”

কথাগুলো সবসময় মিথ্যা নয়। বাস্তবেই অনেক মানুষ কঠিন ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন। সংসার, সন্তান, অসুস্থতা, চাকরি, পড়াশোনা, বৃদ্ধ মা বাবার দেখাশোনা, জীবিকার সংগ্রাম সব মিলিয়ে দিন কখন শেষ হয়ে যায়, বোঝাই যায় না।

তাই ব্যস্ত মানুষকে অপরাধী বানানো এই পোস্টের উদ্দেশ্য নয়।

প্রশ্নটা অন্য জায়গায়।

আমাদের সত্যিই সময় নেই, নাকি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কোনো সময়ই নেই?

ফোন হাতে নিলে বিশ মিনিট কখন পার হয়ে যায়, বুঝি না। একটি ভিডিও দেখতে গিয়ে আরও দশটি দেখে ফেলি। মানুষের খবর, মন্তব্য, স্টোরি, বাজার, কাজ, আড্ডা, অপ্রয়োজনীয় চিন্তা সবকিছুর জন্য সময় বের হয়। কিন্তু কুরআনের জন্য পাঁচ মিনিট চাইলে মনে হয় দিনটা খুব ছোট।

তখন হয়তো সমস্যাটা শুধু সময়ের নয়।

সমস্যাটা priority-এরও।

আল্লাহ তাআলা সময়ের শপথ করে বলেন,

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

“সময়ের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।”
সূরা আল আসর, ১০৩:১–২

আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলোর একটি, সময়ের শপথ করেছেন। কারণ সম্পদ হারালে আবার অর্জন করা যায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হলেও কখনো ফিরে আসতে পারে। কিন্তু যে এক ঘণ্টা চলে গেল, তা পৃথিবীর কোনো মূল্যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

আমরা সময়কে শুধু ঘড়ির কাঁটা দিয়ে মাপি। অথচ সময় আসলে আমাদের জীবন।

একদিন চলে যাওয়া মানে জীবনের একটি দিন কমে যাওয়া। একটি বছর শেষ হওয়া মানে শুধু ক্যালেন্ডার বদলানো নয়, আমাদের নির্ধারিত আয়ুর একটি বছর ফুরিয়ে যাওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুস্থতা ও অবসর।”
সহিহ বুখারি, ৬৪১২

এই হাদিসে ব্যবহৃত অর্থটি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো। মানুষের হাতে মূলধন ছিল, কিন্তু সে তার সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি। সুস্থ শরীর ছিল, কিছু অবসর ছিল, সুযোগ ছিল, কিন্তু পরে বুঝল সেই সময় আর নেই।

আমরা প্রায়ই ভাবি, “একটু ফ্রি হলে শুরু করব।”

কিন্তু জীবনের আশ্চর্য সত্য হলো, কাজ কখনো পুরোপুরি শেষ হয় না। একটি দায়িত্ব শেষ হলে আরেকটি আসে। সন্তান বড় হলে অন্য চিন্তা আসে। পড়াশোনা শেষ হলে চাকরি আসে। চাকরি হলে সংসারের দায়িত্ব বাড়ে। সংসার গুছালে স্বাস্থ্য দুর্বল হতে শুরু করে।

যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য সম্পূর্ণ ফাঁকা জীবনের অপেক্ষা করে, তার অপেক্ষা হয়তো কোনো দিনই শেষ হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে।”
সূরা আল মুনাফিকূন, ৬৩:৯

এখানে সম্পদ ও সন্তানকে খারাপ বলা হয়নি। এগুলো আল্লাহর নিয়ামত। কিন্তু নিয়ামত যখন দাতাকে ভুলিয়ে দেয়, তখন সেটাই পরীক্ষায় পরিণত হয়।

কাজ করা ইবাদত হতে পারে। সন্তানকে যত্ন করাও ইবাদত হতে পারে। হালাল রিজিকের চেষ্টা, অসুস্থ মানুষের সেবা, সংসারের দায়িত্ব পালন সবই সওয়াবের কাজ হতে পারে।

কিন্তু এগুলোর মাঝেই যদি ফরজ নামাজ হারিয়ে যায়, আল্লাহর স্মরণ মুছে যায়, তাওবা পিছিয়ে যেতে থাকে, তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করা জরুরি।

আমি আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করছি, নাকি দায়িত্বের অজুহাতে আল্লাহকেই ভুলে যাচ্ছি?

নফস আমাদের খুব বড় পরিকল্পনা দেখায়। প্রতিদিন এক পারা কুরআন, এক ঘণ্টা ইলম, দীর্ঘ তাহাজ্জুদ, অনেক যিকির। পরিকল্পনাটি এত বড় হয় যে শুরু করাই কঠিন হয়ে পড়ে। তারপর নফস বলে, “এত সময় তো নেই। আজ থাক।”

অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যে আমল নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প।”
সহিহ বুখারি, ৬৪৬৫; সহিহ মুসলিম, ৭৮৩

প্রতিদিন পাঁচ মিনিট অর্থসহ কুরআন পড়া, মাঝে মাঝে এক ঘণ্টা পড়ে আবার কয়েক মাস ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে ভালো হতে পারে।

প্রতিদিন অল্প ইস্তিগফার, নিয়মিত সকাল সন্ধ্যার কিছু যিকির, ঘুমানোর আগে দুই মিনিট আত্মসমালোচনা, সালাতের পর একটি ছোট দোয়া এগুলো দেখতে ছোট। কিন্তু এই ছোট আমলগুলোই অন্তরকে জীবিত রাখে।

সমস্যা অনেক সময় এই নয় যে আমাদের হাতে ত্রিশ মিনিট নেই।

সমস্যা হলো, আমরা পাঁচ মিনিটকেও মূল্যবান মনে করি না।

আমরা মনে করি, পুরো অধ্যায় পড়তে না পারলে কুরআন খোলার দরকার নেই। দীর্ঘ সময় দোয়া করতে না পারলে ছোট দোয়াও করি না। বড় পরিবর্তন করতে না পারলে একটি ছোট গুনাহের দরজাও বন্ধ করি না।

এভাবেই “সময় নেই” কথাটা ধীরে ধীরে “কিছুই করব না” কথায় পরিণত হয়।

এই অজুহাত থেকে বের হওয়ার কিছু বাস্তব উপায়

প্রথমত, ইবাদতকে অবসরের কাজ বানাবেন না। দিনের শেষে সময় বেঁচে থাকলে আল্লাহকে দেব, এমন মনোভাব বদলাতে হবে। ফরজ সালাতকে দিনের কেন্দ্র বানান। অন্যান্য কাজ সালাতের চারপাশে সাজান।

দ্বিতীয়ত, ছোট সময়কে ব্যবহার করুন। পাঁচ মিনিট কুরআন, গাড়িতে বা হাঁটার সময় যিকির, রান্নার মাঝে ইস্তিগফার, ঘুমের আগে তিন মিনিট দোয়া। অল্প সময়ও আমলের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

তৃতীয়ত, ফোনের সময় হিসাব করুন। অনেক ফোনে দৈনিক screen time দেখা যায়। সেখানে এক বা দুই ঘণ্টা দেখে তারপর “সময় পাই না” বললে নিজের কাছে সৎ হওয়া কঠিন।

চতুর্থত, একটি নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে আমল জুড়ে দিন। ফজরের পর পাঁচ মিনিট কুরআন, মাগরিবের পর সন্ধ্যার যিকির, ঘুমানোর আগে ইস্তিগফার। নির্দিষ্ট trigger থাকলে আমল অভ্যাসে পরিণত হয়।

পঞ্চমত, সবকিছু একদিনে শুরু করবেন না। এই সপ্তাহে শুধু একটি আমল বেছে নিন। সেটি ছোট হলেও নিয়মিত করুন। তারপর ধীরে ধীরে আরেকটি যোগ করুন।

আর যারা সত্যিই কঠিন পরিস্থিতিতে আছেন, অসুস্থ, শিশু সামলাচ্ছেন, একাধিক কাজ করছেন বা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তারা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করুন। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। আপনার ছোট আন্তরিক আমলও আল্লাহর কাছে অনেক মূল্যবান হতে পারে।

তবে অসহায়তা ও অজুহাতের পার্থক্য অন্তর জানে।

আজ নিজেকে জিজ্ঞেস করুন,

আমি সত্যিই সময় পাচ্ছি না, নাকি যে সময় পাচ্ছি তা অপ্রয়োজনীয় জায়গায় হারাচ্ছি?

আল্লাহর জন্য আমার দিনের নির্দিষ্ট কোনো অংশ আছে?

ফোনের জন্য ক্লান্তি বাধা হয় না, কিন্তু কুরআনের সময় কেন ঘুম আসে?

আমি কি বড় সুযোগের অপেক্ষায় ছোট সুযোগগুলো নষ্ট করছি?

মনে রাখবেন, আল্লাহ আমাদের কাছে এমন সময় চান না যা আমাদের নেই। তিনি আমাদের দেওয়া সময়ের মধ্যেই তাঁর হক আদায় করতে বলেন।

আপনার দিন হয়তো খুব ব্যস্ত।

কিন্তু একটি আয়াত পড়ার সময় আছে।
একবার আন্তরিকভাবে “আস্তাগফিরুল্লাহ” বলার সময় আছে।
একটি হারাম দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার সময় আছে।
দুই মিনিট নিজের রবের সামনে বসার সময় আছে।

পরিবর্তনের জন্য সবসময় অনেক সময় লাগে না।

কখনো একটি সত্যিকারের মুহূর্তই যথেষ্ট।

আল্লাহ আমাদের সময়ের মূল্য বোঝার তাওফিক দিন। অপ্রয়োজনীয় কাজে জীবন নষ্ট করা থেকে রক্ষা করুন। আমাদের ব্যস্ততাকে ইবাদতে পরিণত করুন এবং কাজের মাঝেও তাঁকে স্মরণ করার জীবন্ত অন্তর দান করুন।

আমিন।

একবারের ছাড় কীভাবে ধীরে ধীরে স্থায়ী অভ্যাস হয়ে যায়?

১. সময় না থাকা আর priority না থাকা এক বিষয় নয়।
২. সম্পূর্ণ অবসর নয়, নিয়মিত ছোট সময় দরকার।
৩. পাঁচ মিনিটের আমলও একটি অন্তর বদলে দিতে পারে।
৪. ফোনের সময় আছে, অথচ কুরআনের সময় নেই কেন?
৫. আজ একটি ছোট আমল নির্দিষ্ট করুন।

ব্যস্ত জীবনে আমল ধরে রাখার ৫টি সহজ পদ্ধতি

১. ফজরের পর পাঁচ মিনিট অর্থসহ কুরআন পড়ুন।
২. যাতায়াত বা ঘরের কাজের সময় যিকির করুন।
৩. সালাতের পর অন্তত একটি নির্দিষ্ট দোয়া পড়ুন।
৪. দৈনিক screen time থেকে দশ মিনিট কমিয়ে আমলে দিন।
৫. রাতে ঘুমানোর আগে তিন মিনিট তাওবা ও আত্মসমালোচনা করুন।

♡ পোস্টটি Save করে রাখুন এবং আজই একটি পাঁচ মিনিটের আমল শুরু করুন।

⇪ এমন কাউকে শেয়ার করুন, যিনি দ্বীনের পথে ফিরতে চান কিন্তু ব্যস্ততার কারণে শুরু করতে পারছেন না।

☐ আপনার দিনের কোন সময়টুকু নিয়মিতভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করতে পারবেন?

সবাই তো করছে...

নফসের অজুহাত | পর্ব ০৮
সবাই তো করছে...

আমাদের নফসের সবচেয়ে পুরোনো, সবচেয়ে জনপ্রিয়, আর সবচেয়ে বিপজ্জনক অজুহাতগুলোর একটি হলো— “সবাই তো করছে...”।
সবাই একটু হারাম দেখছে, সবাই একটু গীবত করছে, সবাই একটু মিথ্যা বলছে, সবাই একটু ফ্রি-মিক্সিং করছে, সবাই একটু সুদের সিস্টেমে জড়িয়ে আছে, সবাই একটু দুনিয়ামুখী— তাহলে আমি আলাদা হয়ে কী করব?

এই কথাটাই অনেক সময় একজন মানুষকে ধীরে ধীরে গুনাহর মধ্যে স্বাভাবিক করে ফেলে। শুরুতে যে কাজটা দেখে অন্তর কেঁপে উঠত, পরে সেটাই “এতটাও কিছু না” মনে হতে থাকে। কারণ নফস চায় না আপনি সত্যকে সত্য হিসেবে দেখুন; নফস চায় আপনি সংখ্যাকে সত্যের জায়গায় বসিয়ে দিন।

কিন্তু একজন মুমিনের প্রশ্ন “কতজন করছে?” না। একজন মুমিনের প্রশ্ন হলো, “আল্লাহ কি এটা পছন্দ করেন?”
মানুষের ভিড় কখনো হক-বাতিলের মাপকাঠি নয়। সমাজ কোনো কিছুকে normal বানিয়ে ফেললেই তা halal হয়ে যায় না। বরং বহু সময় সমাজের normal জিনিসই আল্লাহর কাছে মারাত্মক অপছন্দনীয় হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,
“আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।”
(সূরা আল-আন‘আম, ৬:১১৬)

এই আয়াতটি খুব গভীর। এখানে আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন— অধিকাংশ মানুষ কোনো পথে আছে মানেই সেই পথ সঠিক নয়। সত্যকে জানতে হলে ওহীর দিকে ফিরতে হবে, ভিড়ের দিকে নয়। কারণ মানুষ অনেক সময় আবেগে চলে, প্রবণতায় চলে, সংস্কৃতিতে চলে, ট্রেন্ডে চলে। কিন্তু মুমিন চলবে দলিলের ভিত্তিতে।

আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন,
“যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ করো, তারা বলে — বরং আমরা তো সেটারই অনুসরণ করব, যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদের পেয়েছি।”
(সূরা আল-বাকারা, ২:১৭০)

এটাই মানুষের পুরোনো রোগ। আগে ছিল পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুসরণ, এখন হয়েছে সমাজ, বন্ধু, trend, influencer, culture— এসবের অন্ধ অনুসরণ। ভাষা বদলেছে, কিন্তু রোগ বদলায়নি। আজও মানুষ গুনাহকে justify করে এই বলে যে, “আমি একা তো না”, “সবাই এমন”, “এখনকার যুগে এগুলো normal”।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
“ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত হিসেবে, এবং তা আবার অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং সুসংবাদ সেই গরীব/অপরিচিতদের জন্য।”
(সহিহ মুসলিম)

এই হাদিস আমাদের একটা সাহস দেয়। আপনি যদি সত্যের পথে হাঁটতে গিয়ে আলাদা হয়ে যান, মানুষ যদি আপনাকে old-fashioned বলে, too much religious বলে, over বলে— তাহলে ভেঙে পড়বেন না। সবসময় majority-এর সাথে না থাকাটাই অনেক সময় ঈমানের প্রমাণ। কারণ হক অনেক সময় ভিড়ে হারিয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহর কাছে তা হারায় না।

> **সম্পাদকীয় নোট:** সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিজে সত্যের প্রমাণ নয়; একইভাবে শুধু আলাদা হওয়াও ঈমান বা সত্যের প্রমাণ নয়। মাপকাঠি হলো কুরআন-সুন্নাহর দলিল ও সঠিক বোঝাপড়া। এই অংশের উদ্দেশ্য crowd-pressure-কে শরঈ দলিল বানানো থেকে সতর্ক করা।

ভাবুন তো, কিয়ামতের দিন আপনি যদি বলেন, “হে আল্লাহ, সবাই করত, তাই আমিও করেছি”— এই অজুহাত কি কোনো উপকারে আসবে? মানুষ কি আপনার গুনাহর বোঝা কাঁধে নেবে? কেউ নেবে না। সেদিন প্রত্যেকেই নিজের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তাই আজ যে crowd আপনাকে সাহস দেয়, আখিরাতে সেই crowd আপনার পাশে দাঁড়াবে না।

আসল শক্তি হলো, যখন সবাই ভুল পথে যাচ্ছে তখন নিজেকে থামাতে পারা। যখন সবাই হালকা করে দেখছে, তখন ভয় করতে পারা। যখন সবাই হাসছে, তখনও হৃদয়ে আল্লাহর ভয় বাঁচিয়ে রাখা। এটা সহজ না, কিন্তু এটাই মুমিনের পথ।

তাই নিজের কাছে কিছু প্রশ্ন করুন—
আমি কি কোনো কাজ শুধু এজন্য করছি যে আশেপাশের সবাই করছে?
আমি কি কখনো দলিল না জেনে culture-কে দ্বীন ভেবে নিয়েছি?

আমি কি আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের normal judgement-কে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি?

আমি কি ভিড়ের সাথে থাকতে গিয়ে নিজের অন্তরের sensitivity হারিয়ে ফেলছি?

মনে রাখবেন, গুনাহর সবচেয়ে dangerous stage হলো— যখন তা আর গুনাহ মনে হয় না। আর এই অবস্থায় পৌঁছাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে "সবাই তো করছে" mentality। তাই আজ থেকেই শিখি: ভিড় নয়, সত্যকে মানদণ্ড বানাতে হবে। সমাজ নয়, ওহী হবে দিশারি। trend নয়, taqwa হবে compass।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নফসের প্রতারণা থেকে হেফাজত করুন, সংখ্যার মোহ থেকে বাঁচান, এবং হককে হক হিসেবে দেখে তা অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

১. "সবাই করছে" — এই কথাটা অনেক গুনাহর দরজা খুলে দেয়।
২. সত্য কখনো সংখ্যার ওপর দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় দলিলের ওপর।
৩. যে কাজ মানুষ normal বানিয়েছে, আল্লাহও কি তা normal বানিয়েছেন?
৪. ভিড়ের সাথে থাকা সহজ, হকের ওপর থাকা কঠিন।
৫. আজকের society-proof যুক্তি আখিরাতে কোনো উপকার করবে না।

ভিড় নয়, সত্যকে মানদণ্ড বানানোর ৫টি উপায়

১. কোনো কিছু popular হলেই halal ধরে নেবেন না।
২. কোনো কাজের আগে জিজ্ঞেস করুন: আল্লাহ কি এটা পছন্দ করেন?
৩. যাদের সাথে থাকলে গুনাহ normal লাগে, সে সঙ্গ reconsider করুন।
৪. দলিলভিত্তিক ইসলাম শিখুন, culture-based ইসলাম না।
৫. একা হলেও সঠিক পথে থাকার দোয়া ও সাহস রাখুন।

মানুষ কী বলবে?

নফসের অজুহাত | পর্ব ০৯

মানুষ কী বলবে?

অনেক ভালো কাজ এই একটি বাক্যের কাছে এসে থেমে যায়— “মানুষ কী বলবে?” কেউ পর্দা করতে চায়, কিন্তু ভাবে আত্মীয়রা কী বলবে। কেউ নামাজে নিয়মিত হতে চায়, কিন্তু ভাবে বন্ধুদের সামনে বদলে গেলে তারা হাসবে না তো? কেউ হারাম সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসতে চায়, কিন্তু ভয় পায়— “ও কি ভাববে?” কেউ দ্বীনের পথে একটু দৃশ্যমানভাবে চলতে চায়, কিন্তু নিজের ভেতর থেকেই একটা চাপ আসে — “এতটা করলে মানুষ আমাকে কেমন দেখবে?”

মজার ব্যাপার হলো, অনেক সময় এই “মানুষ” আসলে বাস্তব কোনো মানুষও না। এটা আমাদের নফসের তৈরি এক ছায়া, এক চাপ, এক মানসিক কারাগার। নফস চায় না আমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দিকে ফিরি। তাই সে সরাসরি বলে না “গুনাহ করো”; বরং বলে, “এখন না”, “পরে করো”, “এভাবে করলে লোকে কী বলবে?” এভাবেই সে মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ থেকে সরিয়ে রাখে।

একজন মুমিনের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হওয়া উচিত— আল্লাহ কী বলবেন? কিন্তু আমরা অনেক সময় সেটাকে বদলে ফেলি— মানুষ কী বলবে? এখানেই সমস্যার শুরু। যখন সৃষ্টির দৃষ্টি স্রষ্টার হুকুমের চেয়ে বড় হয়ে যায়, তখন অন্তর দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন আমল পিছিয়ে যায়, তাওবা পিছিয়ে যায়, সত্য বলা পিছিয়ে যায়, এমনকি নিজের পরিচয়টাও ঝাপসা হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো।” (সূরা আল-মায়িদাহ, ৪৪) এই আয়াত শুধু আলিম, দায়ী বা কোনো বিশেষ মানুষের জন্য নয়; এটা আমাদের সবার জন্য এক গভীর শিক্ষা। অর্থাৎ মানুষের চাপ, সমাজের দৃষ্টি, আত্মীয়ের মন্তব্য, বন্ধুদের কটুক্তি— এগুলোর কোনোটাই আল্লাহর হুকুমকে পিছিয়ে দেওয়ার কারণ হতে পারে না।

> **Context note:** সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৪৪-এর মূল প্রসঙ্গ হলো আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ও কিতাবের সাক্ষ্য বহন। “মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো” অংশটি এখানে সেই মূল context অক্ষুণ্ণ রেখে personal reflection হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আল্লাহ আরও বলেন, “যারা আল্লাহর রিসালাত পৌঁছে দেয়, তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।” (সূরা আল-আহযাব, ৩৯) সত্যিকার ঈমান মানুষকে এক ধরনের অন্তরশক্তি দেয়। সে অশ্রদ্ধা করে না, অহংকারও করে না; কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের ভয়কে নিজের সিদ্ধান্তের কেন্দ্রেও বসায় না।

বাস্তব জীবনে দেখুন— এক বোন শালীন পোশাক পরতে চায়, কিন্তু বলে, “এখন করলে সবাই আলাদা চোখে দেখবে।” এক ভাই সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেকে গড়তে চায়, কিন্তু ভাবে, “বন্ধুরা মজা করবে।” কেউ গান, সিরিজ, হারাম আড্ডা, অনুচিত মেলামেশা ছাড়তে চায়; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয় পায়— “তাহলে আমি কি backward হয়ে যাব?” অথচ কিয়ামতের দিন এদের কেউই আমার পক্ষে দাঁড়াবে না। কবরের অন্ধকারে, হাশরের ময়দানে, হিসাবের মুহূর্তে— “মানুষ কী বলবে” এই প্রশ্নের কোনো মূল্য থাকবে না। তখন একটাই প্রশ্ন হবে— আমি আল্লাহর সামনে কী নিয়ে দাঁড়ালাম?

একটি বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে মানুষের সন্তুষ্টির ওপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তার জন্য মানুষকে যথেষ্ট করে দেন। আর যে মানুষকে খুশি করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, তাকে আল্লাহ মানুষের দিকেই ছেড়ে দেন। এই কথার অর্থ খুব গভীর। আপনি যদি আল্লাহর জন্য কিছু ছাড়েন, আল্লাহ আপনার ক্ষতি করেন না। হয়তো শুরুতে কিছু কথা শুনতে হবে, কিছু অস্বস্তি হবে, কিছু মানুষ দূরে যাবে; কিন্তু এর বদলে আপনি এমন এক সম্মান পাবেন যা মানুষের মুখের প্রশংসা দিয়ে কখনো পাওয়া যায় না— আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতার সম্মান।

সত্য কথা হলো, মানুষ কখনো পুরোপুরি সন্তুষ্ট হবে না। আপনি দ্বীনের পথে এলে একদল বলবে "বেশি ধার্মিক হয়ে গেছে।" আপনি যদি দ্বীন থেকে দূরে থাকেন, অন্যরা বলবে "এত মুসলিম হয়েও কিছু মানে না।" কাজেই মানুষকে সন্তুষ্ট করার প্রকল্পের শেষ নেই। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো, যাঁর সন্তুষ্টি সত্যিই জরুরি— তাঁর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন— আমার জীবনে কোন ভালো কাজটা আমি শুধু "মানুষ কী বলবে" ভেবে পিছিয়ে রেখেছি? কোন গুনাহটা আমি শুধু "মানুষের সাথে adjust করতে হয়" বলে ছাড়তে পারছি না? কোন আমলটা আমি মনে মনে ঠিক করেছি, কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে শুরু করছি না? আজ যদি মৃত্যু এসে যায়, তখন কি আমি বলতে পারব— "আমি বদলাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মানুষ কী বলবে ভেবে পারিনি"?

মুমিনের পথ সবসময় সহজ নয়, কিন্তু পরিষ্কার। সে বিনয়ী হয়, কিন্তু ভীরু নয়। সে মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে, কিন্তু আল্লাহর হুকুমের বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি কেনে না। সে জানে, মানুষের মন্তব্য ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি চিরস্থায়ী।

আসুন, আমরা নফসের এই অজুহাতটাকে চিনে ফেলি। “মানুষ কী বলবে” নয়— “আল্লাহ কী পছন্দ করেন” এটাই হোক আমাদের সিদ্ধান্তের মাপকাঠি। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে দৃঢ় করুন, সত্যকে সত্য হিসেবে দেখার তাওফিক দিন, এবং মানুষের ভয় নয়— একমাত্র তাঁর ভয় ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের জীবন ভরে দিন। আমিন।

কমেন্টে লিখতে পারেন: “আল্লাহর সন্তুষ্টিই যথেষ্ট।”

আগামী পর্ব: নফসের অজুহাত | পর্ব ১০ — “ঈমান তো হৃদয়ে আছে, এত বাহিরের দরকার কী?”

“ঈমান তো হৃদয়ে আছে...”

“ঈমান তো হৃদয়ে আছে...”

“নামাজটা নিয়মিত হয় না, তবে আমার ঈমান হৃদয়ে আছে।”

“পর্দা করি না, কিন্তু মনটা পরিষ্কার।”

“সম্পর্কটা ঠিক না জানি, তবে আমার উদ্দেশ্য খারাপ নয়।”

“কিছু হারাম ছাড়তে পারছি না, তাতে কী? আল্লাহ তো আমার অন্তর জানেন।”

“দ্বীন বাহ্যিকভাবে দেখানোর বিষয় নয়। ঈমান তো হৃদয়ে থাকে।”

কথাটির প্রথম অংশ সত্য।

ঈমানের মূল জায়গা হৃদয়।

কিন্তু নফস সত্যের একটি অংশ নিয়ে যখন বাকি সত্যটুকু আড়াল করে, তখন সেই সত্য বাক্যটিই আত্মপ্রবঞ্চনার হাতিয়ার হয়ে যায়।

হ্যাঁ, ঈমান হৃদয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই ঈমান হৃদয়ে জীবন্ত আছে, নাকি শুধু মুখের দাবিতে আছে? জীবন্ত ঈমান কি মানুষের সিদ্ধান্ত, নামাজ, দৃষ্টি, কথা, উপার্জন, পোশাক, সম্পর্ক ও চরিত্রে কোনো প্রভাবই ফেলবে না?

একটি গাছের জীবন মাটির নিচে থাকা শিকড়ে। শিকড় চোখে দেখা যায় না। কিন্তু শিকড় জীবন্ত হলে তার প্রভাব কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলে দেখা যায়। কেউ যদি বলে, "আমার গাছের শিকড় খুব ভালো," অথচ গাছটিতে কোনো পাতা নেই, কোনো বৃদ্ধি নেই, দীর্ঘদিন ধরে শুকিয়ে যাচ্ছে—তাহলে শিকড়ের অবস্থাও পরীক্ষা করতে হয়।

ঈমানও শুধু লোককে দেখানোর কোনো বাহ্যিক পোশাক নয়। আবার এমন গোপন দাবিও নয়, যার কোনো প্রভাব জীবনে দেখা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু হৃদয়ের অনুভূতির কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, তাঁর আয়াত পাঠ করা হলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, তারা রবের ওপর ভরসা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর দেওয়া রিজিক থেকে ব্যয় করে। এরপর তাদেরই সত্যিকার মুমিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের বর্ণনায় হৃদয়ের অবস্থা, আল্লাহর ওপর নির্ভরতা এবং দৃশ্যমান আমল পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।
— সূরা আল আনফাল, ৮:২–৪

সূরা আল আসরেও আল্লাহ মানুষকে ক্ষতি থেকে মুক্ত হওয়ার পথ দেখাতে গিয়ে শুধু "ঈমান এনেছে" বলে থেমে যাননি। ঈমানের সঙ্গে সৎকর্ম, সত্যের উপদেশ এবং ধৈর্যের উপদেশকে যুক্ত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের হৃদয় ও আমলের দিকে তাকান।"
— সহিহ মুসলিম, ২৫৬৪

খেয়াল করুন, এখানে শুধু হৃদয় বলা হয়নি।

হৃদয় ও আমল—দুটিই বলা হয়েছে।

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন, ঈমানের ষাটেরও বেশি বা সত্তরেরও বেশি শাখা রয়েছে। সর্বোচ্চ শাখা হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা, নিচের শাখাগুলোর একটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো, আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা। অর্থাৎ ঈমান অন্তরের বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ নয়; তা মুখের স্বীকৃতি, চরিত্র এবং বাস্তব কাজেও প্রকাশ পায়।
— সহিহ মুসলিম, ৩৫

তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্য বুঝতে হবে।

এই পোস্টের উদ্দেশ্য কারও অন্তরের ঈমান মাপা নয়। কারও কোনো গুনাহ বা দুর্বলতা দেখে তাকে ঈমানহীন ঘোষণা করাও নয়। একজন মুমিন দুর্বল হতে পারেন, গুনাহে পড়ে যেতে পারেন, কোনো ফরজ পালনে অলসতা করতে পারেন। আমরা সবাই কোনো না কোনো জায়গায় সংগ্রাম করছি।

কিন্তু দুর্বলতা স্বীকার করা আর দুর্বলতাকে দ্বীনের ব্যাখ্যা বানানো এক নয়।

একজন বলেন,

"আমি জানি এটা ভুল। আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করুন।"

আরেকজন বলেন,

"এগুলো দরকার নেই। আমার ঈমান তো হৃদয়ে আছে।"

প্রথম কথায় লজ্জা আছে, নিজের ভুল বোঝার অনুভূতি আছে এবং ফিরে আসার দরজা খোলা আছে।

দ্বিতীয় কথায় ভুলটাকেই গুরুত্বহীন করে দেওয়ার চেষ্টা আছে।

এখানেই নফসের অজুহাত।

আমরা যদি সত্যিই বিশ্বাস করি আল্লাহ আমাদের দেখছেন, তাহলে গোপন অবস্থায় সেই বিশ্বাসের কোনো প্রভাব থাকবে না?

যদি সত্যিই বিশ্বাস করি সালাত আল্লাহর নির্দেশ, তাহলে দিনের পরিকল্পনায় সালাতের কোনো জায়গা থাকবে না?

যদি বিশ্বাস করি হালাল ও হারামের হিসাব হবে, তাহলে উপার্জন ও সম্পর্কের সিদ্ধান্তে তার কোনো প্রভাব থাকবে না?

যদি বিশ্বাস করি জিহ্বার প্রতিটি কথার হিসাব আছে, তাহলে গীবত, অপমান ও মিথ্যার সময় হৃদয়ের ঈমান একবারও বাধা দেবে না?

যদি বিশ্বাস করি আল্লাহর সন্তুষ্টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে মানুষের মন্তব্যের ভয়ে তাঁর নির্দেশ বারবার পিছিয়ে যাবে কেন?

এখানে নিজের দিকে তাকানো দরকার, অন্যের দিকে নয়।

নিজের অন্তরকে কিছু প্রশ্ন করুন

১. আমার ঈমান কি আমার সালাতের সময়কে রক্ষা করছে?
নাকি দুনিয়ার সব কাজ শেষ হলে আল্লাহর জন্য অবশিষ্ট ক্লান্ত সময়টুকু রাখছি?

২. কোনো গুনাহের পর আমার অন্তরে কষ্ট হয়?
নাকি “ঈমান হৃদয়ে আছে” বলে নিজের অপরাধবোধও চুপ করিয়ে দিই?

৩. আল্লাহর বিধান আর নিজের ইচ্ছার মধ্যে সংঘর্ষ হলে আমি কাকে অগ্রাধিকার দিই?

৪. মানুষের সামনে যেমন, একা থাকলেও কি আল্লাহকে স্মরণ করি?

৫. কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে সংশোধনের চেষ্টা করি, নাকি বলি—“আল্লাহ আমার মন জানেন”?

৬. আমার ঈমান কি আমার কথা, ব্যবহার, দায়িত্ববোধ ও মানুষের হকের ওপর কোনো প্রভাব ফেলছে?

৭. গত এক বছরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি কোন বাস্তব পরিবর্তন করেছি?

শেষ প্রশ্নটির উত্তর যদি খুঁজে না পাই, তাহলে হতাশ হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু থেমে নিজের অবস্থা পরীক্ষা করা দরকার।

কারণ জীবন্ত ঈমানের অর্থ নিখুঁত হয়ে যাওয়া নয়।

জীবন্ত ঈমানের অর্থ হলো, গুনাহ করলে ভেতরে ব্যথা থাকা। পড়ে গেলে আবার উঠতে চাওয়া। ভুল বুঝলে অজুহাত না বানিয়ে ফিরে আসা। আল্লাহর নির্দেশ শুনলে নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে তার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া।

হয়তো আপনার পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এখনো ঠিক হয়নি। আজ একটি ওয়াক্তকে শক্তভাবে রক্ষা করুন।

হয়তো পূর্ণ পর্দায় আসতে কষ্ট হচ্ছে। আজ একটি বাস্তব পরিবর্তন করুন।

হয়তো কোনো হারাম অভ্যাস পুরোপুরি ছাড়তে পারছেন না। আজ তার একটি দরজা বন্ধ করুন।

হয়তো আপনার আচরণে রাগ, অহংকার বা কঠোরতা আছে। আজ একজন মানুষের কাছে ক্ষমা চান।

ঈমানের প্রমাণ বড় বড় ঘোষণা নয়। অনেক সময় তা ছোট একটি আনুগত্য, একটি গোপন তাওবা এবং ভুলের বিরুদ্ধে প্রতিদিনের সংগ্রাম।

এই সিরিজে নফসের অনেক পরিচিত অজুহাত নিয়ে কথা হয়েছে।

“কাল থেকে বদলাব।”

“সবাই তো করে।”

“এটা তো ছোট গুনাহ।”

“আল্লাহ তো ক্ষমাশীল।”

“আমি তো কারও ক্ষতি করছি না।”

“নিয়ত তো ভালো।”

“সময়ই পাই না।”

“মানুষ কী বলবে?”

এই সব অজুহাতের আড়ালে শেষ পর্যন্ত একটি প্রশ্নই লুকিয়ে থাকে—

আমি কি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেকে বদলাব, নাকি নিজের বর্তমান অবস্থাকে রক্ষা করার জন্য একটি সুন্দর যুক্তি খুঁজব?

“ঈমান হৃদয়ে আছে”—এই বাক্যটি যেন আনুগত্য থেকে পালানোর ঢাল না হয়।

বরং আমরা বলি,

“ঈমান হৃদয়ে আছে। তাই আমি চাই, তার আলো আমার নামাজে, দৃষ্টিতে, কথায়, উপার্জনে, সম্পর্ক ও চরিত্রেও প্রকাশ পাক।”

আজ কাউকে নিজের ঈমান প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

শুধু আল্লাহর সামনে সৎভাবে বলুন,

“হে আল্লাহ, আমার মুখের দাবির চেয়ে আমার ঈমানকে সত্য ও জীবন্ত করে দিন। আমার অন্তরকে এমনভাবে পরিবর্তন করুন, যেন তার প্রভাব আমার আমলেও দেখা যায়। যেসব ভুলকে আমি সুন্দর অজুহাতে ঢেকে রেখেছি, সেগুলো চিনিয়ে দিন। আমাকে অজুহাত নয়, আনুগত্য বেছে নেওয়ার তাওফিক দিন।”

আমিন।

শেষ Self-Audit প্রশ্ন

আমার ঈমান কি শুধু একটি পরিচয়, নাকি আমার জীবন পরিচালনার শক্তি?

১. ঈমান হৃদয়ে থাকে, কিন্তু তার প্রভাব জীবনে দেখা যায়।
২. দুর্বলতা স্বীকার করা আর ভুলকে বৈধ বানানো এক নয়।
৩. আল্লাহ হৃদয়ও দেখেন, আমলও দেখেন।
৪. নিখুঁত হওয়া নয়, ফিরে আসার চেষ্টা ঈমানের সৌন্দর্য।
৫. গত এক বছরে ঈমান আমার জীবনে কী পরিবর্তন এনেছে?

ঈমানকে জীবনে প্রকাশ করার ৫টি ছোট পদক্ষেপ

১. আজ একটি ফরজ আমলকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করুন।

২. একটি গোপন গুনাহের দরজা বন্ধ করুন।

৩. প্রতিদিন অন্তত পাঁচ মিনিট অর্থসহ কুরআন পড়ুন।

৪. কারও হক নষ্ট করলে ক্ষমা চান বা হক ফিরিয়ে দিন।

৫. রাতে প্রশ্ন করুন, “আজ আমার ঈমান কোন সিদ্ধান্ত বদলেছে?”

SERIES COMPLETED

“নফসের অজুহাত” সিরিজ এখানেই ১০ পর্বে সম্পূর্ণ।

তথ্যসূত্র ও প্রেক্ষাপট

Reference audit v2 verified the current cited set and added context-sensitive notes where needed. Qur’an/Hadith Bangla wording remains meaning-based rendering; no independent scholar endorsement is claimed.

অধ্যায় ১ · “কাল থেকে বদলাব…”

Qur'an 59:18, 63:10; Sahih al-Bukhari 6412.

অধ্যায় ২ · “সবাই তো করে…”

Qur'an 6:116, 5:100, 17:36; Sahih Muslim 145 (Islam began strange / good tidings for the strangers).

অধ্যায় ৩ · “এটা তো ছোট গুনাহ…”

Qur'an 18:49, 83:14; warning about seemingly insignificant sins: Musnad Ahmad 3818, authenticated in Sahih al-Jami' 2687; Bukhari 6492 is a supporting companion report about deeds people deem tiny.

অধ্যায় ৪ · “আল্লাহ তো ক্ষমাশীল…”

Qur'an 39:53–54, 31:33; Sahih Muslim 2751 (Allah's mercy prevails over His wrath), Sahih Muslim 2755 (balance of fear and hope).

অধ্যায় ৫ · “আমি তো কারও ক্ষতি করছি না”

Qur'an 75:14–15, 83:14; Jami' at-Tirmidhi 3334 (black spot on the heart after sin; repentance polishes it clean).

অধ্যায় ৬ · “নিয়ত তো ভালো”

Qur'an 18:110; Sahih al-Bukhari 1 / Sahih Muslim 1907 (deeds and intentions); Sahih al-Bukhari 2697 / Sahih Muslim 1718 (religious acts without sanction are rejected).

অধ্যায় ৭ · “সময়ই পাই না…”

Qur'an 103:1–2, 63:9; Sahih al-Bukhari 6412; Sahih al-Bukhari 6465; Sahih Muslim 783b.

অধ্যায় ৮ · “সবাই তো করছে…”

Qur'an 6:116, 2:170; Sahih Muslim 145.

অধ্যায় ৯ · “মানুষ কী বলবে?”

Qur'an 5:44; Jami' at-Tirmidhi 2414 (seeking Allah's pleasure over people's pleasure).

অধ্যায় ১০ · “ঈমান তো হৃদয়ে আছে…”

Qur'an 8:2–4 and 103:1–3; Sahih Muslim 2564c (Allah looks to hearts and deeds); Sahih Muslim 35b (branches of faith).

EDITION & REVISION SYSTEM

সংস্করণ ও সংশোধন

Website edition হবে canonical/latest। ধর্মীয় উৎস বা substantive লেখায় ভবিষ্যৎ পরিবর্তন হলে দৃশ্যমান revision note রাখতে হবে।

Current edition: v1.0 · First Edition · 22 Oct 2026.

This edition preserves the ten source chapters and recorded context notes. Visual, source-preservation and Arabic copy/search QA are recorded in the release record.

NAHWA EDITIONS · NE-003

নফসের অজুহাত

Canonical Web Edition

https://nahwaaddeen.com/editions-nofser-ojuhat/

Canonical Web Edition. The website remains the latest version; this PDF is a portable reading/print companion.

---

v1.0 · FIRST EDITION · 22 OCT 2026